অন্যান্যদের সংজ্ঞা

পরবর্তীকালে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক রীতিনীতির আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন, জন ম্যাকিনটোশ (John Makintosh) অতীতে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে অথবা প্রয়োগের নজির আছে এবং সাধারণভাবে সবাই মানে, এমন সব রাজনৈতিক রীতিনীতিকে সাংবিধানিক রীতিনীতি বা কনভেনশন বলে বর্ণনা করেছেন। মার্শাল ও মুডি (Marshall and Moodie) সাংবিধানিক রীতিনীতির সংজ্ঞার্থ করে বলেছেন, সাংবিধানিক রীতিনীতি হল "সাংবিধানিক আচরণ সম্পর্কে সেইসব নিয়মকানুন যেগুলিকে সংবিধান যারা কার্যকর করে তারা তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মান্য বলে মনে করে, কিন্তু যেগুলি আদালতের দ্বারা অথবা পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অধ্যক্ষদের দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়।"[২] এর মধ্যে ম্যাকিনটোশ-এর সংজ্ঞাটি বর্ণনামূলক, অর্থাৎ যা বাস্তবে দেখা যায় তারই বর্ণনা। কিন্তু মার্শাল ও মুডি যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি নির্দেশাত্মক, অর্থাৎ এতে অভিজ্ঞতা, এবং শুধু অভিজ্ঞতাই নয়, সাংবিধানিক নীতির ভিত্তি কী হওয়া উচিত তারও ইঙ্গিত রয়েছে। মার্শাল ও মুডি-র সংজ্ঞার অনুরূপ, কিন্তু আরও স্পষ্ট, একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ও. হুড ফিলিপস (O. Hood Philips)। হুড ফিলিপস প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে সাংবিধানিক রীতিনীতি হল, "রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের কতকগুলি নিয়মকানুন, যাদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়মকানুন প্রযোজ্য তাদের কাছে এগুলিকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয়, কিন্তু এগুলি আইন নয়, কারণ আদালত বা পার্লামেন্ট এগুলিকে বলবৎ করে না।"[৩]

লিখিত ও প্রথাগত আইনের মধ্যে পার্থক্য

সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অনেক সময় "অলিখিত আইন" অথবা প্রচলিত প্রথা (Custom) বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে এর কোনোটিকেই বোঝায় না। সাংবিধানিক রীতিনীতি "অলিখিত আইন নয়", কারণ তা আইনই নয়। গ্রেট ব্রিটেনে "অলিখিত আইন" বলতে বোঝায় বিচারক-সৃষ্ট সাধারণ আইন বা কমন-লকে। বহুকাল ধরে মান্য হয়ে আসছে এমন প্রথাগত আইনও (Customary law) ব্রিটেনে আছে। তবে সাংবিধানিক রীতিনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

(খ) বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সাংবিধানিক রীতিনীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এইসব বৈশিষ্ট্য থেকে সাংবিধানিক রীতিনীতির প্রকৃতিকে জানা যায়। যেমন—

প্রথমত, অভ্যাস, ব্যবহার বা প্রথা ইত্যাদি এবং সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। মানুষ অভ্যাসমতো আচরণ করে কিংবা প্রথা মেনে চলে, কিন্তু এর কোনোটিই বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে, সাংবিধানিক রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা জেনেই এগুলিকে মান্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সাংবিধানিক রীতিনীতি রাজনৈতিক নিয়মকানুন বা বিধি (rules), অর্থাৎ এইসব রীতিনীতি শুধুমাত্র শাসনব্যবস্থার পরিচালনার সঙ্গেই সম্পর্কিত। অন্যান্য

---

(২) Conventions are, "rules of constitutional behaviour which are considered binding by and upon those who operate the constitution but which are not enforced by the law courts ..... nor by the presiding officers in Houses of Parliament."—Quoted by Wade and Bradley, P. 20.

(৩) Conventions are, "rules of political practice which are regarded as binding on those to whom they apply, but which are not laws as they are not enforced by the courts or the House of Parliament".—O. Hood Phillips. P. 113.

শাসনব্যবস্থায় এই ধরনের রীতিনীতির গুরুত্ব ... ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। **দ্বিতীয় কারণ**, ব্রিটেনের জনসাধারণ কখনোই সরকার পরিচালনার নিয়মকানুনকে আইনের মতো বিধিবদ্ধ রূপ দিতে উৎসাহবোধ করেনি। যেমন, ১৬৮৮-র বিপ্লবের পরে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলিকে আইনের রূপ দেওয়া হয়নি।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কীভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তা ব্যাখ্যা করতে এবং ব্রিটেনের সংবিধানের পরিবর্তন ও বিকাশ কীভাবে ঘটেছে তা বুঝতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে লক্ষ করতে হয়। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসারে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির আর-একটি কাজ হল, শাসনব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যাবলির মধ্যে অভিযোজন ঘটানো, অর্থাৎ, অন্যভাবে বললে, কার্যাবলির সঙ্গে সংগতি রেখে শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে পরিবর্তনসাধন। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় বিগত তিনশো বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে তার মূলে আছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির এই ভূমিকা। যেমন—১৬৮৮ সালের আগে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র ছিল শক্তিশালী, কিন্তু এখন ব্রিটেনের রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছে, পাশাপাশি গড়ে উঠেছে মন্ত্রীসভা-পরিচালিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা—এই পরিবর্তন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমেই ঘটেছে, আইন করে নয়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিকে তাই ব্রিটেনের সংবিধানের অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলা যায়।

(৯) আইনের অনুশাসন

ডাইসি তাঁর Law of the Constitution বই-এ ব্রিটিশ সংবিধানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। **এর একটি**, সংসদ বা পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। **দ্বিতীয়টি**, আইনের অনুশাসন। এবং **তৃতীয়টি**, সাংবিধানিক রীতিনীতি।

আইনের অনুশাসনের ধারণাটি কিছুটা অস্পষ্ট। নানাভাবে এর অর্থ করা যায়। তবে ডাইসি তিনটি সুস্পষ্ট অর্থে আইনের অনুশাসনকে ব্রিটিশ সংবিধানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই তিনটি অর্থ হল—

(ক) আইনের চূড়ান্ত প্রাধান্য। অর্থাৎ, কেউই স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী নয়। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এবং আইন ভঙ্গ করার সুস্পষ্ট অপরাধ সাধারণ আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতে প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

(খ) আইনের চোখে সবাই সমান। অর্থাৎ, প্রতিটি ব্যক্তিকে, তাঁর মর্যাদা বা অবস্থা যাই হোক না কেন, দেশের সাধারণ আইন মেনে চলতে হয়। সে কোনো আইন ভঙ্গ করলে বা অপরাধ করলে বিচার হবে সাধারণ আদালতে।

(গ) ব্যক্তির স্বাধীনতার—যেমন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের কিংবা সভাসমিতি করার স্বাধীনতার—উৎস সাংবিধানিক আইন নয়, তা আদালতের দ্বারা নির্ধারিত ও বলবৎ হয়। সাংবিধানিক আইন তার থেকেই গড়ে উঠেছে।

ডাইসি তাঁর তত্ত্বে যেভাবে আইনের অনুশাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন তা নিয়ে তর্ক আছে। আইভর জেনিংস ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন (পরে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে)।

(১৩) নাগরিক অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারের ভিত্তি সাধারণ আইন। যেহেতু ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয় এবং যেহেতু পার্লামেন্ট বা আইনসভা যে-কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এবং সাংবিধানিক আইনের কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই, সেজন্য যেসব অধিকার ব্রিটেনের নাগরিকরা ভোগ করে তা কোনো অর্থেই মৌলিক বা অপরিবর্তনীয় নয়। জনমতের প্রভাব, বিরোধীদলের সতত সজাগ দৃষ্টি এবং আদালতের নিয়ন্ত্রণ-প্রবণ ব্যাখ্যা—এগুলিই ব্রিটেনে নাগরিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে বলে মনে করা হয়।

সাম্প্রতিককালে—বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—'আইনের অনুশাসনের' ধারণাটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য লাভ করেছে। যার ফলে, এখন ন্যূনতম মানবিক অধিকারকে সুনির্দিষ্ট করে তা ঘোষণার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। মানবিক অধিকার সম্পর্কে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে সমঝোতাও হয়েছে। একটি সনদ রচিত হয়েছে যেটি European Convention on Human Rights বলে পরিচিত। গ্রেট ব্রিটেন এই বোঝাপড়ার অংশীদার। ফলে, ব্রিটেনের একজন নাগরিক বর্তমানে তার অধিকার রক্ষার জন্য মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালতেও উপস্থিত হতে পারে। মানবাধিকার-সংক্রান্ত ইউরোপীয় কমিশনের কাছে আবেদন জানানোর অধিকারও এখন স্বীকৃত। তবে, এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে যে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে, তা এখনও নৈতিক স্তরেই রয়ে গেছে, কেন না, মানবাধিকারের সনদ ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩.২. সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা কীভাবে চলে, তা বুঝতে হলে সাংবিধানিক রীতিনীতি সম্পর্কে জানা দরকার। ই. এ. ফ্রিম্যান (E. A. Freeman) ১৮৭২ সালে প্রকাশিত তাঁর Growth of the English Constitution বই-এ প্রথম আইনের সঙ্গে সাংবিধানিক রীতিনীতির পার্থক্য দেখিয়ে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তবে, ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে তুলে ধরেন ডাইসি (Dicey) তাঁর Law of the Constitution বই-তে। ডাইসির বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা বা সংবিধান সম্পর্কে সব লেখাতে সাংবিধানিক রীতিনীতির পর্যালোচনা অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে এসেছে।

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতি কাকে বলে?

সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি কতকগুলি অলিখিত নিয়মকানুন যেগুলি আইন নয় কিন্তু সাংবিধানিক আইনের মতো মান্য হয়। 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' (Constitutional convention) নামকরণটি করেছিলেন ডাইসি। এইসব নিয়মকানুনের বর্ণনা দিয়ে ডাইসি লিখেছেন—"এগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করলেও বাস্তবে এগুলি আইন নয়, কারণ এগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য নয়"[১]।

(১) "Conventions, understandings, habits or practice which though they may regulate the conduct of the several members of the sovereign power ..... are not in reality laws at all since they are not enforced by the courts".—Diecy, P. 24.